দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...14 MAR 20..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গন

কোচিং ও ভর্তি নীতিমালা

এ জেড এম আনারুল করিম

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যে শর্তারোপের সুপারিশ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে গঠিত এই কমিটি বাস্তবতার কারণে কোচিং সরাসরি নিষিদ্ধ না করে শিক্ষকদের তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বন্ধের সুপারিশ করেছেন। তবে ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে কোন শিক্ষক বাড়িতে নিয়ে কোচিং করাতে পারবেন।

দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোচিং বাণিজ্য আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ঠিকমত পড়া না বুঝিয়ে তাদের কাছে কোচিং করতে বাধ্য করেন এমন অভিযোগও জোরেশোরে উত্থাপিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে যায়। অভিভাবকদের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে রিট করা হলে আদালত কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা পরিপত্র কেন জারি করা হবে না, তা জানতে রুল জারি করেন। এ রুলের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের (মাধ্যমিক) নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত ১৯ জানুয়ারি এ কমিটি যে সুপারিশ করেছে তাতে কোচিং বাণিজ্যে শর্তারোপের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল শিক্ষার্থীদের বাছাই করে অতিরিক্ত ক্লাস পুনরায় চালুর পক্ষে মতামত দিয়েছে। এতে বলা হয়, এ ধরনের ক্লাসের জন্য সম্মানী পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি কোচিং নিয়ন্ত্রণের যে সুপারিশ করেছে তাকে একটি অগ্রগতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ প্রস্তাবের মধ্যে দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদা ক্লাস নেয়ার প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য হলেও স্কুলের বাইরে কোচিংয়ের সুযোগ জিইয়ে রাখা প্রকারান্তরে এ ব্যবস্থাকে ডালপালা বিস্তারে সাহায্য করবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। এ বাণিজ্য অভিভাবকদের জন্য এতটাই অভিশাপ হয়ে উঠেছে যে, অনেকে তাদের আয়ের এক বড় অংশ সন্তানদের কোচিংয়ের পেছনে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনে অসম প্রতিযোগিতাও সৃষ্টি করছে এ ব্যবস্থা। তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও কিভাবে কোচিং নামের এই আপদ থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রেহাই পেতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে হবে।

ঢাকার নামকরা স্কুলগুলো কর্তৃক গৃহীত নির্ধারিত ভর্তি ফি অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ঢাকার ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্লজ্জ রাজনৈতিক অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দুর্দশা ও হয়রানির চিত্র আরেকবার জাতি প্রত্যক্ষ করলো। ভর্তি বাণিজ্যের বিষয়টি নতুন নয়, রাজধানীসহ সারা দেশেই মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অভিভাবকরা বেশ কয়েক বছর ধরে সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে এক দুর্ভেদ্য চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাই এরকম একটি সংলাপের আয়োজন ছিল খুবই সময়ানুগ, ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তাদের হতাশা ও হয়রানির বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সরাসরি জানিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কথা শুনেছেন এবং যথাসাধ্য প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যাবতীয় অনিয়মের বিরুদ্ধে। এখানে আশঙ্কার সাথে একটি বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে যে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছেন সংসদ সদস্যবৃন্দ। অভিযোগ আছে যে, এ ভর্তি বাণিজ্যের আর্থিক বন্টনে তাদেরও অংশভাগ থাকে। শিক্ষার যথাযথ প্রসারে সহায়তা করার পরিবর্তে তারা নির্লজ্জভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে মুখিয়ে থাকেন এবং সময়ে সময়ে স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পেশীশক্তি প্রদর্শন করতেও পিছপা হন না। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংবাদকর্মীর সাথে রাজধানীর একটি স্কুলের সভাপতি-সাংসদের গুরুতর লাঞ্ছনার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনিতেই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলোতেই ছাত্র-রাজনীতির নামে কদাকার হানাহানি, রক্তারক্তি দেখেশুনে দেশের মানুষ দিশেহারা। তার ওপর শিক্ষাঙ্গন কলুষিত করার পাঁয়তারায় এখন স্কুলের তথাকথিত অভিভাবক রাজনীতিকদের অশুভ সংশ্লিষ্টতা বন্ধ করার যে দাবি এ সংলাপে উঠেছে তা যথার্থ।

বর্তমানে শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ নিষিদ্ধ করা হলেও তা অনুসৃত হচ্ছে নামমাত্র, রাজধানীর ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪টি প্রতিষ্ঠানই সরকারি ভর্তি নীতিমালার বাইরে টাকা নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও সমান নয়। স্কুলগুলোর প্রধানেরা বেশি ফি আদায়ের কারণ হিসেবে কতগুলো বিষয় উল্লেখ করে থাকেন, যার মধ্যে রয়েছে এমপিওভুক্তির বাইরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। সেসব খাতের যুক্তিযুক্ত ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে সরকারকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, অভিভাবকদের ওপর খড়গহস্ত হওয়া এক্ষেত্রে সমীচীন নয়।

স্কুলগুলোর মধ্যকার মানের যে পার্থক্য তাও কমাতে হবে। নইলে লটারির মাধ্যমে ভর্তির বিষয়টিও খুব কার্যকর থাকবে না। সব অভিভাবকই চান সন্তানকে সেরা স্কুলে ভর্তি করাতে। যেজন্য লটারির বাইরে, নানান কোটার সূত্রে, অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে ভর্তি চলতে থাকবে। আবার সেরা স্কুলের দাবিতে তারা ভর্তির ও উন্নয়ন ফি'র অর্থ বাড়িয়ে চলবে এবং অভিভাবকেরা জিম্মি হয়ে তা মানতে বাধ্য হবে। পরিকল্পনা করে ঢাকা শহরের সব এলাকায় অন্তত একটি করে 'সেরা' স্কুল গড়ে তুলতে হবে। তাতে নিজ এলাকাতেই সন্তানকে ভর্তি করতে উদ্বুদ্ধ হবেন অভিভাবকরা। অন্যদিকে যেসব খাত দেখিয়ে স্কুলগুলো অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে, সেসব খাতে সরকার আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। মোটের ওপর বলা যায়, স্কুলগুলোর পরিচর্যা যেমন করতে হবে, তেমনি বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা রোধ করার নিমিত্তে স্কুলগুলোকে নিয়মিত মনিটর করতে হবে। তবেই সরকারের সব আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতি অন্ততপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে সুফল পাবে এবং সুশিক্ষিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হবে। এটাই হোক আমাদের একমাত্র কামনা, বাসনা।